ইউনিট ৫: মানব সম্পদ উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার কার্যক্রমসমূহের ভূমিকা

Role of Non-Formal and Continuing Education Programs in HRD

ভূমিকা

একটি দেশের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ হল সে দেশের মানব সম্পদ। মানব সম্পদই অন্যান্য সম্পদকে অর্থবহ করে তোলে। তাই পৃথিবীর সব দেশেরই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য মানুষকে সম্পদে পরিণত করা। শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন। একটি দেশের মোট জাতীয় আয় সে দেশের উন্নয়নের আংশিক চিত্র তুলে ধরে মাত্র। উন্নয়ন নির্ধারনের অন্যতম সূচক হচ্ছে মানব সম্পদ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যা, তাদের শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান, জীবিকার নিশ্চয়তা প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল এবং উৎপাদনক্ষম হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অর্থের। এ অর্থের যোগান সহজতর হয় যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মক্ষম ও উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার গুরুত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে।

আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়বস্তুকে নিচের ছয়টি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ-৫.১: মানব সম্পদ উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার ভূমিকা

পাঠ- ৫.২: জনসংখ্যা শিক্ষা

পাঠ- ৫.৩: স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা

পাঠ- ৫.৪: পরিবেশ শিক্ষা

পাঠ- ৫.৫: তরুণ এবং সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম

পাঠ- ৫.৬: বয়স্ক শিক্ষা

পাঠ ৫.১: মানব সম্পদ উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার ভূমিকা
Role of Non-Formal and Continuing Education in HRD

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা ও পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- উন্নয়নশীল দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সরকারি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উন্নয়নশীল দেশে উপানুষ্ঠানিক বেসরকারি উদ্যোগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে অব্যাহত শিক্ষা ও এই শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তি উন্নয়নকে বোঝানো হয়। কিন্তু বিষয়টি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। ১৯৬০-এর দশকে সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো মানব সম্পদ উন্নয়নকে একটি দেশের বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের "ইঞ্জিন" হিসেবে গণ্য করত। ১৯৯০ এর দশকে ইউএনডিপি (UNDP) কর্তৃক উপস্থাপিত "মানব উন্নয়ন" ধারণার সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নের একটা সম্পর্ক আছে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যদিও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু টেকসই স্থিতিশীল (Sustainable) উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বা যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানবপুজি গঠন একটি কৌশল। সুতরাং একটি দেশের সামগ্রিক এবং বাহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নে অত্যন্ত সফল ভূমিকা রাখছে। শিল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ উভয়ক্ষেত্রেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে তবে প্রকৃতি এর ভিন্ন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী দলের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আলাদা কার্যক্রম হিসেবে বা সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়ে থাকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই প্রধানতঃ দরিদ্রতার কারণে স্কুলে যেতে পারে না কিংবা স্কুলে গেলেও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র (Primacy Cycle) সমাপ্ত করার পূর্বেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে (Drop out) এসব দেশের বিশাল দরিদ্র নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়ে ও বিভিন্ন ধরনের অসুবিধাগ্রস্থ ছেলেমেয়ে যারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি বা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে এবং নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠী তাদের সবাইকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ (Second Chance of Education) প্রদান করা যায়। সেজন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে দ্বিতীয় সুযোগদানকারী শিক্ষা কার্যক্রম বলা হয়। এছাড়া জনবহুল দেশে সমাজের সব লোকের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মকুশলতা, সচেতনতা, বুদ্ধি, আয়বর্ধক কর্মসূচি, পরিবেশ সচেতনতা, পুষ্টি উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং আধুনিকায়ন।

সবার জন্য কর্মসংস্থান, বিশেষ করে আত্মকর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ অবদান রাখতে পারে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা দেশের মূলধারার

শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বাইরে, তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে দেশের জনগণের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ কর্মক্ষেত্র। এছাড়া গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি, জীবনাচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সচেতনতা (Awareness) বৃদ্ধি ও কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রভাবিত করাও (Advocacy) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্রমপ্রসারিত পরিসরের উদাহরণ। এসব কর্মকান্ডে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তোলা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নবতর কর্মপ্রয়াস হিসেবে স্বীকৃত নানা রকমের চাহিদা কেবল আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর ও কার্যক্রমের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূরক ও পরিপূরক শিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়। বিভিন্ন বয়সী মানুষের নানারকম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে কোন দেশেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা বলা যাবে না। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোনো কোনো দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সাব-সিস্টেম (Sub-system) হিসেবে স্বীকৃত।

কোন কোন মহল এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেবল নিম্ন পর্যায়ের বিদ্যা বা দক্ষতা অর্জনের উপযোগী। একথা সত্য যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচি প্রধানতঃ সাক্ষরতা অর্জন, মৌলিক শিক্ষা ও জীবন দক্ষতা (Life Skills) এবং প্রাথমিক ও মধ্য পর্যায়ের দক্ষতা অর্জনের মধ্যে অনেকটা সীমাবদ্ধ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ সামাজিক এবং জনজীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এসব কার্যক্রম প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কিন্তু এটি চিরন্তন ব্যবস্থা নয়। সামগ্রিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত ধরনের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে আজকাল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার এমন সব কার্যক্রম চালু আছে, যা অনেক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতো না। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ক্রমান্বয়ে অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিগন্তকে প্রসারিত করে মূল্যবান অবদান রাখতে পারে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

- **স্বল্পমেয়াদিঃ** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা স্বল্পমেয়াদি। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনানুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে সময় প্রয়োজন সেভাবে প্রত্যেক কার্যক্রমের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।
- **সময়োচিতঃ** যে সময়ে যে ধরনের কার্যক্রম দরকার সে সময় সে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। সেই কার্যক্রম যাদের উপকারে আসে তাদের সবাইকে বয়স ও যোগ্যতা নির্বিশেষে যোগদান করতে দেয়া হয়।
- **খণ্ডকালীনঃ** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খণ্ডকালীন হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অন্য কাজ করতে পারে। কর্মরত শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রমের সময় রদবদল করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
- **সার্টিফিকেট বা ডিগ্রিমুখী নয়ঃ** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচি প্রধানত ব্যবহারিক, কর্মভিত্তিক কিংবা প্রায়োগিক। সেজন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা সার্টিফিকেট কিংবা ডিগ্রির দ্বারা প্রমাণ করতে হয় না। শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ শেষে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়।
- **শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিতঃ** শিক্ষার্থী দলের বিশেষ প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। কর্মভিত্তিক দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষাকালীন সময়েও বিষয়বস্তুর রদবদল করা যায়।

- **কর্ম ও পরিবেশ-প্রতিবেশ সম্বন্ধীয়:** শিক্ষাক্রম নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশ প্রতিবেশ সংশ্লিষ্ট কর্ম ও জীবনযাপনে প্রয়োগ ও ব্যবহারোপযোগী বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেয়া হয় বেশি।
- **স্থানীয় সুযোগ-সুবিধাভিত্তিক:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সেজন্য সবসময় নতুন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভের জন্য স্থানীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শেখে বলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মুক্তাঙ্গন শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত।
- **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক:** শিক্ষাদান বা প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব উৎসাহ ও উদ্যোগকে প্রাধান্য দেয়া হয়। শিক্ষক প্রধানত পরামর্শদাতা ও সহায়কের (Facilitator) ভূমিকা পালন করেন।
- **ব্যয় কম:** স্থানীয় সুযোগ সুবিধা ও খণ্ডকালীন শিক্ষক বা সহায়ক ব্যবহার করায় স্বল্পব্যয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় সাহায্য সহযোগিতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্যও পাওয়া যায়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যক্তিগত খরচ (Private Cost) নেই বললেই চলে।
- **নমনীয় কাঠামো:** কার্যক্রমের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর কাঠামো নির্ভর করে। কোনো বাঁধাধরা কাঠামো নেই। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র বা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির ওপর।
- **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ:** কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্থানীয় উদ্যোগ, সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে এ জাতীয় কার্যক্রমের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কেন্দ্রীভূত নয়। বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি মৌল বৈশিষ্ট্য।

মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায়

হারবিসন এবং মায়ারস তাদের গবেষণায় মানব সম্পদ উন্নয়নে ৫টি উপায় উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল–

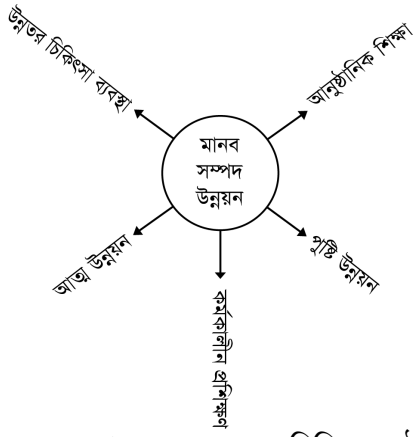

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা:** প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে।

২. **আত্ম উন্নয়ন:** জ্ঞান, দক্ষতা এবং সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে অর্জন করে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতুহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করা।

৩. **পুষ্টি উন্নয়ন:** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং কর্মজীবন দীর্ঘ হয়। পুষ্টি ও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত ইহা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই ফল।

৪. **কর্মকালীন প্রশিক্ষণঃ** উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সংগঠন যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত।

৫. **উন্নততর চিকিৎসা সেবাঃ** উন্নততর চিকিৎসা এবং গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহারের দক্ষতা

বর্তমান প্রেক্ষাপট উক্ত উপায়গুলোর সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহারে প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেসব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সচরাচর গৃহীত হতে দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে–

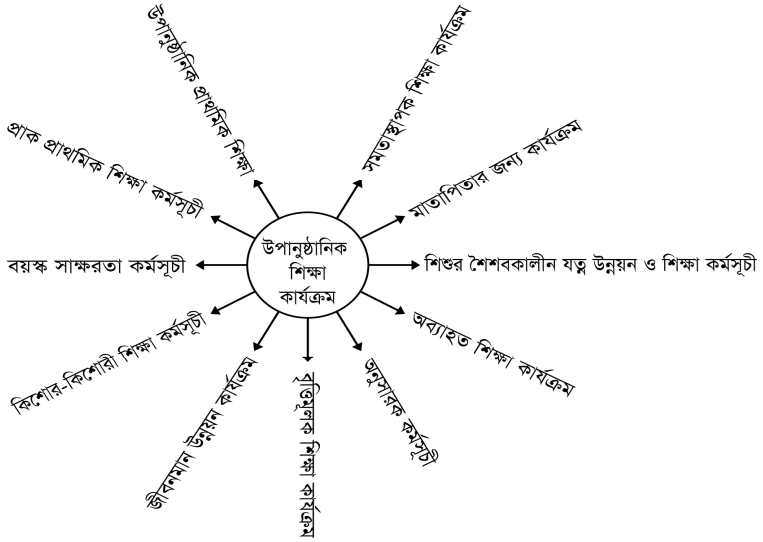

শিল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ উভয় ক্ষেত্রেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে তবে প্রকৃতি ভিন্ন। শিল্পোন্নত দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

প্রথমত ; নার্সারী স্কুল, দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং শ্রবণ দর্শন এর দ্বারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষককে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এবং পরিপূরক হিসেবে স্কুলগামী শিশুদের বিভিন্ন খেলাধুলা সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কার্যাবলির মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত: আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে যার দ্বারা একজন অশিক্ষিত মা স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি তার শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিতে বা দক্ষতাকে সময়োপযোগী করে নিতে পারে। এটা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বা কোন দিন স্কুলে যায়নি এমন বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি তাদের জন্য সাক্ষরতার ব্যবস্থা করা।

সেলাই প্রশিক্ষণ

মৎস্য চাষ

সাক্ষরতা ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ (NGO) সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ও কেউ কেউ ঋণ দিচ্ছে যেমন হাঁস-মুরগী পালন, উন্নত মানের শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, রেশম পোকার চাষ, মুক্তার চাষ, মৌমাছি চাষ, ফুল চাষ, গবাদী পশু পালন, চিংড়ি চাষ, ড্রাইভিং, সেলাই প্রশিক্ষণ, মহিলাদের জন্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম। তাছাড়া কিছু প্রাইভেট কোম্পানির চাকুরি সম্পর্কিত দক্ষতার প্রশিক্ষণ যেমন, হেয়ার ড্রেসিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। আবার অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- যুব উন্নয়ন সংস্থা, মহিলা বিষয়ক সংস্থা, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, মৎস ও হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা দিয়ে থাকে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নে নানাবিধ উপায়ে যেমন নিরক্ষরকে সাক্ষর, সাক্ষরকে অব্যাহত শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য উপর উল্লেখিত নানাবিধ শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখছে।

অব্যাহত শিক্ষা (Continuing Education)

প্রাথমিক শিক্ষা বা মৌলিক শিক্ষার ধারাবাহিকতায় শিক্ষার একস্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তরণের জন্য পরিচালিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলোকে বলা হয় অব্যাহত শিক্ষা। তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরবর্তী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। বহু দেশে উচ্চতর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে খণ্ডকালীন পড়াশোনার মাধ্যমে নানা রকম সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত স্বল্পকালীন কর্মসূচি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসম্মত হয় না। ফলে নব্য সাক্ষরদের (Neo-literate) জন্য প্রয়োজন হয় সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচি (Post-literacy program)। এসব অনুসারক (Follow-up) কর্মসূচির মাধ্যমে নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতাকে সংহত, উন্নত ও পরিশীলিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এছাড়া মানুষের অর্জিত মৌলিক সাক্ষরতা দক্ষতা (Basic literacy skills) স্ব-উদ্যোগে সব সময় ব্যবহারের সুযোগ হয় না, এজন্য সাক্ষরতা উত্তর (Post literacy) কার্যক্রম দরকার হয়। যাতে মানুষ সাক্ষরতা দক্ষতার চর্চায় নিয়োজিত থাকতে পারে। অনুসারক কর্মসূচির মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য সাক্ষরতা দক্ষতাকে একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের (Functional) উপযোগী অবস্থায় নিয়ে আসা এবং স্বশিক্ষার (Self learning) মাধ্যমে শিখন অব্যাহত রাখা।

বাংলাদেশে ১৯৮০-১৯৯০ এর দশকে বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি বিস্তার লাভ করেছে। এসব ছাড়াও সাক্ষরতা-উত্তর এবং অব্যাহত শিক্ষার কিছু কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় যেমন- (১) গ্রামশিক্ষা মিলন কেন্দ্র (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর) (২) গণকেন্দ্র পাঠাগার (ব্র্যাক) (৩) কিশোর-কিশোরী পাঠাগার (ব্র্যাক) (৪) গ্রামীণ পাঠাগার (এফআইভিডিবি) (৫) লোককেন্দ্র (এ্যাকশন এইড) (৬) গণকেন্দ্র (ঢাকা আহসানিয়া মিশন) (৭)

বক্স লাইব্রেরী (নিজেরা শিখি/আরডিআরএস/গণ উন্নয়ন কেন্দ্র) (৮) জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার (ইসলামী ফাউন্ডেশন (৯) সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা পাইলট কর্মসূচি(ডি এন এফ পি-এর তত্ত্বাবধানে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত); (১০) গণবিদ্যালয় (বইস); (১১) গ্রামীণ পাঠচক্র (প্রশিকা); (১২) হিরামন (ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ও কারিগরি সহায়তা ইউটিন-গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রামীণ শিক্ষার সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচি); (১৩) রিসোর্স সেন্টার (মূলত স্থায়ী লাইব্রেরি-গ্রামীণ শিক্ষা কর্মসূচি) এবং (১৪) সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (CMES) মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি তিন ধরনের অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, যেমন- সাক্ষরতা-পরবর্তী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও বৃত্তিকুশলতা উন্নয়ন শিক্ষা।

ডাকার বিশ্বশিক্ষা ফোরাম ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ডাকার সম্মেলনের পর বাংলাদেশ সরকার তিনটি সাক্ষরতা-উত্তর এবং অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব প্রকল্পের জন্য ১১-৪৫ বছর বয়সের ব্যক্তিবর্গ লক্ষ্যদল (Target group) হিসেবে বিবেচিত হয়। সরকার যে তিনটি কার্যক্রম গ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে–

১. মানব উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম। এই প্রকল্প ৩২টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়সী লোকদের সাক্ষরতা দক্ষতা সুসংহত করা এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়।
২. শহরে কর্মরত শিশু এবং যাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন, তাদের জন্য মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ যেটি ২০০৪ সালে শুরু হয়ে ২০১২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসম্মত জীবন দক্ষতা ভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা।
৩. মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম-২। প্রকল্পকাল ২০০৩-২০১৩ সাল পর্যন্ত। ১১-৪৫ বছর বয়সীদের জন্য বিভাগের ২৯ জেলার ২১০ উপজেলার প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার কথা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নব্য সাক্ষরদের সাক্ষরতা দক্ষতাকে সুসংহত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রদান ও সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় বৃদ্ধি করে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতিমালা ২০০৬ অনুযায়ী অব্যাহত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে–

- বৃত্তিমূলক কর্মসূচি
- উদ্যোক্তা তৈরিকরণ
- কর্মসংশ্লিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
- জীবনমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- সমতাস্থাপন শিক্ষা কার্যক্রম।

উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি বা লক্ষ্যদলের নানা বিষয়ে দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রম সূচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্য নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ হচ্ছে সহায়ক/কুশলী, অন্যপক্ষ শিক্ষার্থী দল। যাদেরকে বলা হচ্ছে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। অব্যাহত শিক্ষার পরিসর বৃদ্ধির ফলে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহত শিক্ষার সাথে কমিউনিটির সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য। কার্যক্রমের উদ্যোক্তা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কোন সংগঠন অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে চাইলে তা দুভাবে সংগঠিত হতে পারে। (১) উদ্যোক্তা সংস্থা নিজেরাই কমিউনিটির সহায়তার অব্যাহত শিক্ষার নির্বাচিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী দল বা জনগোষ্ঠী নির্বাচন করতে পারে। (২) কমিউনিটির

সাথে আলোচনার পর নির্বাচিত এলাকার একটি জরিপ পরিচালনা করা। এলাকার প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করার পর কমিউনিটির মতামত সংগ্রহ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এক বা একাধিক অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি শিখনকেন্দ্র (Community Learning Center-CLC) গড়ে তোলা।

অব্যাহত শিক্ষার কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন–

- প্রথম পদক্ষেপ হলো কার্যক্রমের সমস্যাগুলো ও সময়কাল নির্ধারণ করা।
- দ্বিতীয় পদক্ষেপ একটি কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র (CLC) গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে অবশ্যই কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধকরণ, ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ, অংশীদারিত্ব ও তত্ত্বাবধানের বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে।
- কার্যক্রমের শিক্ষাক্রম ও উপকরণ তৈরি।
- শিক্ষক/সহায়ক/কুশলীদের প্রতিবেদন দেয়া।
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণ করা।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী প্রায় ৭০০ বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন, সহায়কদের প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রয়েছে। এতে অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমগুলো সত্যিকার অর্থে আধুনিক যুগে প্রবেশ করবে এবং কার্যক্রমগুলোর উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হারবিসন এবং মায়ারস মানব সম্পদ উন্নয়নের কয়টি উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন?
   ক. ৩
   খ. ৪
   গ. ৫
   ঘ. ৬

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হল-
   ক. পূর্ণকালীন
   খ. খণ্ডকালীন
   গ. সার্টিফিকেটমুখী
   ঘ. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক

৩. ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বশিক্ষা সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
   ক. ক্যারিবিয়ান
   খ. লাতিন আমেরিকা
   গ. চীন
   ঘ. জমতিয়ন

৪. সাক্ষরতা-উত্তর এবং অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি কিশোর-কিশোরী পাঠাগার কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে?
   ক. ব্র্যাক
   খ. এ্যাকশন এইড
   গ. ইসলামী ফাউন্ডেশন
   ঘ. প্রশিকা

৫. ডাকার বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়?
   ক. ১৯৭১ সালে
   খ. ২০০০ সালে
   গ. ২০০৩ সালে
   গ. ২০০৫ সালে

উত্তরমালা: ১। গ, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। ক, ৫। খ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মুক্তাঙ্গন শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিখনীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত করা হয় কেন–যুক্তি দিন।
৪. অব্যাহত শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতিমালা ২০০৬ অনুযায়ী অব্যাহত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যক্রমগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসর ব্যাখ্যা করুন।
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. উন্নয়নশীল দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সরকারি কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বেসরকারি উদ্যোগ ব্যাখ্যা করুন।
৫. অব্যাহত শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫.২: জনসংখ্যা শিক্ষা
Population Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জনসংখ্যা শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- জনসংখ্যা শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি অন্যতম সমস্যা যা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জনসংখ্যা মূলতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং শারীরিক কারণে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আর এর প্রভাব কৃষি খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবেশসহ রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান জনসমষ্টিকে শিক্ষিত, সচেতন ও দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে এবং জনসংখ্যা বিষয়ক কঠোর সামাজিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এরই প্রেক্ষিতে সত্তর দশকের প্রথম দিক থেকে কোন কোন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমের পাশাপাশি জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বহুমুখী পদ্ধতি অবলম্বনের এক নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের পক্ষ থেকে বিবাহিত দম্পতি ও বয়স্ক কার্যক্রমের মধ্যে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উপলক্ষে জনসংখ্যা ও পরিবার উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া হত তাকেই প্রথম দিকে সাধারণভাবে পারিবারিক জীবন শিক্ষা (Family Life Education) বলা হয়। এ শিক্ষাই পরবর্তীকালে ধারণা ও কাঠামোগতভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে জনসংখ্যা শিক্ষা নামে পরিচিতি লাভ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই নিরক্ষর তাই জনসংখ্যা বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রধানত অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিই নেয়া হতো।

> "কোন দেশের, অঞ্চলের বা বিশ্বের জনসংখ্যার আকার, গঠন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ জ্ঞান আহরণ, জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদির বিশ্লেষণ এবং জীবনে এই ধারাক্রমের (Trend) প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হয়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষাই হল জনসংখ্যা শিক্ষা"।

Massialas (1972) তিনি জনসংখ্যা শিক্ষাকে অনুসন্ধানের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অন্বেষন এবং সেই জ্ঞান ব্যক্তির আচরণিক পরিবর্তনের সহায়ক। এই অর্জিত জ্ঞান পরিণামে জনসংখ্যার প্রকৃতি ও প্রভাব অনুযায়ী ব্যক্তিকে তার উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। (UNESCO, 1971) জনসংখ্যা শিক্ষাকে স্পষ্টতই একটি শিক্ষামূলক কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়টি বিশ্ব, জাতি,

সমাজ ও পরিবার ভিত্তিক জনসংখ্যা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রতি দায়িত্বশীল ও যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

১৯৮১ সালে আফ্রিকান একটি জাতীয় সংস্থা (Conference of African Parliamentarians on Population and Development) জনসংখ্যা শিক্ষা বিস্তারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়টিকে জীবনমান উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলিতে জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমে প্রধানত চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যেমন–

- সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য নিরসন।
- উন্নয়নের জন্য শিক্ষা।
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং
- মেয়েদের জন্য পারিবারিক শিক্ষা।

এ সব বিষয়ে জ্ঞান আহরণকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যৌনশিক্ষা, পরিবার জীবন, পৌরনীতি এবং জনসংখ্যার গতিধারা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে সচেতনভাবে তার কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে এবং জাতীয় জীবনের গুণগত মান উন্নয়নে তার ব্যক্তিগত অবদান রাখতে পারে (UNESCO, 1974)।

আমাদের দেশে একটি জাতীয় প্রকল্প জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়টির বিভিন্ন সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিবেচনা করে আমাদের দেশের উপযোগী করে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তার প্রকৃতিগত বিশ্লেষণ করেছে। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী জনসংখ্যা শিক্ষা হচ্ছে–

ক. একটি সামগ্রিক, সামাজিক শিক্ষা প্রক্রিয়া বিশেষ,
খ. সমস্যা কেন্দ্রিক একটি শিক্ষা।
গ. এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যা পপুলেশন স্টাডি থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে থাকে।
ঘ. ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা সম্পর্কিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান চর্চা করে থাকে।
ঙ. এমন একটি বিষয় যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের গুণগত মান উন্নয়নের ব্যাপারে সহায়তা করে।

জনসংখ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তার বিকাশ ঘটান এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা।

জনসংখ্যা শিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা অথচ এখানে তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। দারিদ্র, নিরক্ষরতা, কর্মসংস্থানের অভাব প্রভৃতি কারণ বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত। তাছাড়া জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে জনসংখ্যা পরিকল্পনা করা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু এটা গ্রামের লোকেরা উপলব্ধি করতে পারে না। প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য নির্ভুল জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যের প্রয়োজন।

→ যেমন- জন্ম, মৃত্যু ও দেশান্তর হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, সমাজ ও পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। জনসংখ্যা শিক্ষার

মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তিই এসব পরিসংখ্যান ও তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে বা তাদের কর্মজীবনে বিভিন্ন বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে।

→ নিরক্ষরতা আজকের দিনে উন্নয়নের একটা বড় রকমের প্রতিবন্ধক। নিরক্ষরতা একটা সামাজিক অভিশাপও। নিরক্ষরতা মানুষকে তার স্বাভাবিক ঝুঁকির বিকাশে কর্মক্ষমতা বুদ্ধি ও সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। জাতীয় আয় ও সম্পদের নিরিখে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান হয়েছে দরিদ্রতম ও সবচেয়ে কম উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। শিক্ষার সাথে ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয়ের একটা বিরাট সম্পর্ক দেখা যায়। শিক্ষিত চাষীর জমিতে উৎপাদনের হার অধিক। শিক্ষিত শ্রমিক অশিক্ষিত শ্রমিকের চেয়ে অধিক উৎপাদন করে থাকে। শিক্ষার প্রসার ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

উন্নত জীবন, জীবনমান (Quality of life) বিকাশের উপায়, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা ইত্যাদি সব বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য জনসংখ্যা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন অযৌক্তিক চিন্তা ও নীতি বিশ্বাস আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মূলে উন্নতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। জনসংখ্যা শিক্ষা এসব অমূলক চিন্তা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করে আমাদের জীবন যাত্রাকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ক পরিস্থিতিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণকে যুক্তিসঙ্গত রূপ দিতে সাহায্য করে। ব্যক্তিকে অপ-প্রচার দ্বারা (Propaganda) অভিভূত করা জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় (Vederman, 1972)। তাই জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা আবশ্যক। কারণ সাধারণ শিক্ষার পাঠদান পদ্ধতির সাথে এর বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই প্রভেদ সম্পর্কে জনসংখ্যা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সকলকে সচেতন হতে হবে তবেই এর বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

সীমিত জনসংখ্যা একটি পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করে। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সংসারের নানা অভাব অনটন ও সংকট দেখা দেয় এবং জীবন মান জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবারের সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করে এবং সংসারে দারিদ্র্য ডেকে আনে। ফলে পারিবারিক অশান্তি, অস্থিরতা এবং হতাশার উদ্রেক হয়। পরিবারের সদস্যদের জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ ও সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য জনসংখ্যা শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু এই বৃদ্ধি যদি মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অত্যধিক বেশি হয়ে যায় তবেই আশঙ্কার কারণ হয়ে দাড়ায়। কোন দেশের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষভাবে যে কারণগুলি দায়ী তা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু ও দেশান্তরের পরিমাণ। তাছাড়া যেসব পরোক্ষ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেগুলো হলো– শিক্ষার অভাব, সামাজিক মূল্যবোধের অভাব, অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা ইত্যাদি।

দেশে শিক্ষিতের হার বেশি হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম থাকে। শিক্ষার অভাব হলে একদিকে যেমন মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে অপরদিকে অশিক্ষা, কুশিক্ষার প্রভাবে মানুষ এ ব্যাপারে নানারূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের জন্মহার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক। গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সাক্ষর মায়েদের চাইতে নিরক্ষর মায়েদের সন্তান সংখ্যা বেশি। আবার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়া মায়েদের চেয়ে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত মায়েদের সন্তান সংখ্যা বেশি। শিক্ষা যেহেতু মানুষের বিবেক বোধকে জাগ্রত করে, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন করে এবং যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাই শিক্ষা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হয়।

কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার প্রবণতা, বহুবিবাহ অধিক পুত্র সন্তান লাভের প্রচেষ্টা, এগুলো সবই অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থার একটি আদর্শমান। অশিক্ষা, অর্থনৈতিক দূরবস্থা ও অপসংস্কৃতি যে কোন সমাজেই অনুরূপ সমস্যা সৃষ্টি করে। এইসব সামাজিক সমস্যাগুলি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামীণ ও কৃষি নির্ভর সমাজে যেহেতু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব থাকে তাই তাদের মধ্যেও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বংশরক্ষা করতে পারা গ্রামীণ সমাজে একটি উলেণ্ঢখযোগ্য মূল্যবোধ। এসব কারণেই একটি বা একাধিক পুত্রের আশায় অনেক পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করে সমাজের সুস্থ পরিবর্তনে বাধাদান করে ফলে তাদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা অনুরূপ কোন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ বেশ দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক মন্দার ফলে যে কোন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়ের উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই বিষয়গুলির উপর থেকে ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব কমতে থাকে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সমাজে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়, মানুষের জীবনমানও নিচু স্তরে নেমে আসে। উন্নয়নশীল দেশে যেহেতু বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার ভরণ পোষণের কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকে না তাই তাদের একমাত্র ভরসা থাকে অধিক সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান যারা আগামী দিনে পরিবারের নিরাপত্তা দিতে পারবে বা অক্ষমদের সেবা শুশ্রুষা ও দেখাশুনার দায়িত্ব নেবে। এ ধরণের বিশ্বাস থেকেই স্বল্প আয়ভূক্ত তথা উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সাথে জন্মহার বৃদ্ধির সম্পর্ক উন্নয়নশীল দেশের সর্বত্রই সমানভাবে দেখা যায়। এ সম্পর্ক অনুধাবন করার জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল তুলনা করা যেতে পারে। যেসব দেশের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কম তাদের প্রজনন হার অত্যন্ত বেশি। যদিও গত কয়েক দশকে পৃথিবীব্যাপী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে তবুও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ হল তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হলেই পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা এবং অসুস্থ অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানোর সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরো কিছু কারণ আছে। যেমন পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক দুর্যোগ ইত্যাদি। যেখানে জীবন যাত্রা সহজ সেখানেই লোক বসতি গড়ে ওঠে এবং অতি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দূর্গম অঞ্চলে কিছু লোক বসবাস করলেও সেখানে প্রতিকূলতার মধ্যে তাদের প্রজনন প্রবণতা খুব একটা বৃদ্ধি পেতে পারে না। যে পরিবেশে সহজেই প্রচুর খাদ্য পাওয়া যায় সেখানে জন্মহার তুলনামূলকভাবে বেশি কারণ খাদ্যের চাহিদা পূরণ হলেই মানুষের প্রজননমূলক আচরণ বৃদ্ধি পায়।

নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা বংশগত কারণও জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক পরিবেশ ও সার্বিক জীবনমানের পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রভাবিত হতে পারে।

কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষ করে মহাদুর্যোগ, যুদ্ধ, মহামারী প্লাবন ইত্যাদি ঘটনার পর মানুষের মধ্যে প্রজনন প্রবণতা বেড়ে যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল

জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি দেশের সার্বিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন- জীবনযাত্রার মান, কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, মাথাপিছু আয় ও পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়ে। ফলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক উন্নতি বাধাগ্রস্থ হয়ে পরিবেশ দূষিত হয়। পরিবেশের ভারসাম্য এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করা খুবই জরুরি কারণ জনসংখ্যা প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে প্রধান কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হল–

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তন করা।
- ছেলে ও মেয়ের বিয়ের বয়স বিলম্বিত করা।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশেষত এন,জি,ও এবং বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্তকরণ।
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবাসহ পরিবার পরিকল্পনাকে একটি সমন্বিত কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন করা।
- দেশের অভ্যন্তরে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ এবং সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধির পাশাপাশি মানব সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থার উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ দান।
- স্বাস্থ্যের অনুকূলে এবং থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করা।
- স্বেচ্ছামূলক বন্ধাকরণকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ; যেমন- ভাতা দান, আধুনিক প্রণালী, সেবা-শুশ্রুষা এবং চিকিৎসার নিশ্চয়তা প্রদান, ডাক্তার এবং সহকারীদের অতিরিক্ত সামাজিক সুবিধা দান।
- অতিরিক্ত সন্তানাদির জন্ম সরকার হতে অনুমতির ব্যবস্থা করা কিংবা কর আরোপ করা।
- গর্ভধারণ প্রতিরোধমূলক শিক্ষা সচেতনতা ও মটিভেশনাল কর্মকাণ্ড বাড়ানোর উপর জোর দেয়া।
- পরিবার পরিকল্পনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একে সামাজিক আন্দোলনের রূপান্তরকরণ।
- শিক্ষা-বিশেষত নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।
- সেবার সম্প্রসারণ এবং সেগুলোর মানোন্নয়ন।

অন্যান্য কর্মসূচি

এ দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে রয়েছে। অতএব তারা আনুষ্ঠানিক জনসংখ্যা শিক্ষার নাগালের বাইরে। তাই জনগণকে জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতন ও অধিক জনসংখ্যার কুফল এবং সমাজের উপর তার প্রভাব এবং ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণে এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য সর্বোপরি জনগণকে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সাহায্য করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১. **গ্রামীণ সমাজ সেবা প্রকল্প:** ১৯৭৪ সালে পল্লী এলাকার ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক-যুবতী ও মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের গৌণ কর্মসূচি হিসাবে মহিলাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।

২. **স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা:** ১৯৬৫ সালে এদেশে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়। এ কর্মসূচি প্রতিটি থানা ও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সরকারিভাবে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছাড়াও এ বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মীগণ গ্রাম অঞ্চলের অশিক্ষিত জনগণকে অধিক সন্তান উৎপাদনজনিত কুফল সম্পর্কে সচেতন করেন এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

৩. **মাদার্স ক্লাব:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশে মাদার্স ক্লাব স্থাপন করেছে। এ ক্লাব মেয়েদের অবসর বিনোদন এবং স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই ক্লাব বিদ্যালয় বহির্ভূত তরুণী ও মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক উপায়ে জনসংখ্যা শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষাদান করে আসছে।

৪. **জনসংযোগঃ** সরকারি প্রচার মাধ্যম (রেডিও এবং টেলিভিশন) জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার ছোট রাখার সুফল ও বড় পরিবারের কুফল সমাজের কাছে তুলে ধরছে। জনসংখ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচারণা, নাটক, নাটিকা, প্রামাণ্য চিত্র, গণসংগীত ইত্যাদি জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কাজ করছে।

উপসংহার

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জনসংখ্যা বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে ভবিষ্যতে পরিকল্পিত পরিবার গঠনে আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং তাদের মাধ্যমে পিতামাতা, অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্যদের সাথে জনসংখ্যা সমস্যাজনিত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান সহজেই হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সহায়তা প্রয়োগ বেশ প্রশংসার দাবীদার। সরকার বিদ্যালয় ও সমাজ উভয়ের ক্ষেত্রেই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা কোন দশকে শুরু হয়?
   ক. পঞ্চাশ দশকে
   খ. ষাট দশকে
   গ. সত্তর দশকে
   ঘ. আশির দশকে

২. আফ্রিকার দেশগুলিতে জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমে কয়টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়?
   ক. একটি
   খ. দুইটি
   গ. তিনটি
   ঘ. চারটি

৩. জাতীয় উন্নয়ন কিসের ওপর নির্ভরশীল?
   ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
   খ. শিক্ষার প্রসার
   গ. সামাজিক উন্নয়ন
   ঘ. গ্রামীণ উন্নয়ন

৪. জনসংখ্যা শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে একজন শিক্ষকের কোন গুণটি বেশী দরকার?
ক. দক্ষতা
খ. আত্মবিশ্বাস
গ. লেখাপড়ার যোগ্যতা
ঘ. পরিবেশ

৫. গণমাধ্যমগুলিতে পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন কিসের ওপরে ভিত্তি করে প্রচার করা দরকার?
ক. সামাজিক প্রেক্ষাপট
খ. বয়স ও শ্রেণি
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ঘ. পরিবেশ পরিস্থিতি

উত্তরমালা: ১। গ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। ক, ৫। খ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জনসংখ্যা শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
২. আফ্রিকার দেশগুলোর জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।
৩. 'UNESCO, 1971' জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কে কী মতামত দিয়েছেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জনসংখ্যা শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৩. জনসংখ্যা রোধ করার ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত মতামত যুক্তিসহ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫.৩: স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা
Health and Nutrition Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- কীভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- মানব সম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

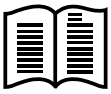

শরীরের সুস্থতা বলতে আমরা শরীর ঠিকমত বাড়ছে কিনা শরীরে কোন রোগ-ব্যাধি আছে কি-না, কাজ করার ক্ষমতা ঠিক মত আছে কি–না এগুলোকে বুঝে থাকি। সমাজের প্রতিটি নাগরিককে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং এ সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞানদানের ব্যবস্থাকেই স্বাস্থ্য শিক্ষা বলে। স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক আমেরিকান শিক্ষাবিদ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী স্মিথ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন– "ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও গোত্রগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অভিজ্ঞতাসমূহের সমষ্টিকে স্বাস্থ্য শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়"। তাছাড়া যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও কার্যকর পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা হয় তাকে স্বাস্থ্য শিক্ষা বলে। যে সব খাদ্য খেলে দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের বৃদ্ধি হয়, দেহ সবল কর্মক্ষম ও নিরোগ থাকে তাকেই পুষ্টিকর খাদ্য বলে। জনগণকে স্বাস্থ ও পুষ্টি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত, উপযোগী তথ্য প্রদানের সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম। পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খাদ্য শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও শক্তি উৎপাদন করে। "Nutrition is the science of nourishing the body" অর্থাৎ দেহের পুষ্টি সাধনের বিজ্ঞানকে পুষ্টি বিজ্ঞান বলে। শরীরের বিবিধ পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী সকল খাদ্য উপাদানকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন–

১. কার্বোহাইড্রেট– শর্করা, চিনি, শ্বেতসার ও সেলুলোজ।
২. তেল বা চর্বি– উদ্ভিদ তেল, মাছ-মাংসের চর্বি, মাখন ও ঘি।
৩. প্রোটিন– ডিম, দুধ, ডাল, বাদাম, মাছ, মাংস।
৪. ভিটামিন– এ, ডি, ই, কে, বি-কমপ্লেক্স, সি, শাকসবজি, দুধ, কলিজা।
৫. খনিজ উপাদান– ক্যালসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন, দস্তা, তামা, দুধ, লবণ, কলিজা।
৬. পানি– ফলের রস, পানীয়, খাবার পানি।

কাজ অনুযায়ী খাদ্যকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে শ্রেণিভূক্ত করা হয়েছে। যেমন–

১. শরীরে শক্তি উৎপাদন করা।
২. দেহ গঠন ও ক্ষয়পূরণ করা।
৩. রোগ প্রতিরোধ করা।

১. **শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য–** শরীরের প্রধান পুষ্টি চাহিদা হচ্ছে শক্তির। খাদ্য জ্বালানি হিসেবে শরীরে শক্তি সরবরাহ করে। যে সকল খাদ্য শক্তি দেয়, এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্যই প্রধান। প্রতি গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের দহনে ৪ ক্যালরি এবং প্রতি গ্রাম তেল, চর্বি হতে ৯ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

২. **দেহ গঠন ও ক্ষয়পূরণকারী খাদ্য–** যে সকল খাদ্য দেহের কাঠামো, পেশী ও গ্রন্থি প্রভৃতি গঠন করে দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করে তাদের মধ্যে প্রোটিন অন্যতম। প্রাণিজ খাদ্য হতে সংগৃহীত প্রোটিনের কার্যক্ষমতা বেশি। তাই এ সকল খাদ্য একাই শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণে সক্ষম। দেহ গঠনকারী খাদ্য দু'ভাবে পাওয়া যায়।
   - প্রাণীজ উৎস– দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা।
   - উদ্ভিজ উৎস– ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি।

৩. **রোগ প্রতিরোধক খাদ্য–** যে সকল খাদ্যবস্তু দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দান করে, তাদের মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ অন্তর্ভুক্ত। সব রকমের রঙিন শাক-সবজি, ফল, ডিম, কলিজা রোগ প্রতিরোধক খাদ্য হিসেবে গণ্য হয়।

   - ভিটামিন 'এ'– রাতকানা ও রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধক।
   - ভিটামিন 'ডি'– রিকেট রোগ প্রতিরোধক।
   - ভিটামিন বি কমপ্লেক্স– বেরিবেরি সহ নানা ধরনের ত্বকের রোগ প্রতিরোধক।
   - ভিটামিন সি– স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধক।

এছাড়াও ক্যালসিয়াম, লৌহ ও আয়োডিনের মত অত্যাবশ্যকীয় খনিজ উপাদানের অভাবে হাড় ও দাঁত দুর্বল হয়, রক্তস্বল্পতা ও গলগন্ড রোগ হয়।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের। এ পুষ্টিকর খাদ্য বয়স অনুযায়ী, শ্রম ও পেশা অনুযায়ী এবং স্বাস্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণ করে। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগ প্রতিরোধ করে তেমনি রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের এক বিরাট অংশ অপুষ্টির শিকার। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অজ্ঞতা হচ্ছে দেশে বিরাজমান পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ।

খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ভাল স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার। দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হলে একজন ব্যক্তিকে পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচন করতে হবে, পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা ও গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কোন কোন খাদ্যে স্বল্পমূল্যে অধিক পুষ্টি পাওয়া যায়, তাও জানতে হবে। কোন বয়সে কোন কোন পুষ্টি চাহিদা কি রকমের হয় তাও জানা দরকার। কারণ একজন বয়স্ক লোকের খাদ্য চাহিদা কখনই একটি বাড়ন্ত শিশু বা কিশোর বা গর্ভবতী মায়ের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। সঠিক পুষ্টির অভাবে যে সব রোগ সচরাচর হয় তা পুষ্টি জ্ঞানের সাহায্যে খুব সহজেই নিরাময়যোগ্য ও প্রতিরোধযোগ্য।

স্বাস্থ্য ভাল রাখার ব্যাপারে পুষ্টি শিক্ষার দ্বারা জনগণকে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়। রান্নার সঠিক পদ্ধতি, পরিবেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা সবই স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকে প্রভাবিত করে।

জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করা হল–

১. অপুষ্টির মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। যেমন–ভিটামিন 'এ' এর অভাবে অন্ধত্ব, আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড ইত্যাদি।
২. সাধারণ প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস হতে পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচন। স্বল্পমূল্যে শাক-সবিজ ও ডাল জাতীয় খাদ্যের সংমিশ্রণে পুষ্টিকর খাবার তৈরির কৌশল জানা।

৩. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো।
৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে খাদ্য পরিবেশন করার গুরুত্ব উপলব্ধি করা।
৫. বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করা।
৬. জনগণের মাঝে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করা যা পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রথম সোপান।
৭. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাত, পা, মুখ, নখ, ত্বক, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস সৃষ্টি করা।
৮. ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্য শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে কাজে লাগিয়ে পরিচ্ছন্নতা আনয়ন করা।
৯. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা এবং তা নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১০. ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত অভ্যাস গঠন উৎপাদনক্ষম জনশক্তি তৈরি করা।
১১. কোন কোন ব্যাধি কোন কোন দেশে মহামারী আকারে বিস্তার করছে এবং এগুলো প্রতিরোধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

সুস্থ্য মা ও শিশু

জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম

ক. স্বল্পমেয়াদী কাযক্রম–

১. মা ও শিশু কল্যাণ সংস্থা। দেশি ও বিদেশি বেসরকারি (NGO) সংস্থাগুলো মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করছে। জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম, টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন এ সরবরাহ, ডায়রিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচি, খাদ্য সমৃদ্ধকরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রভৃতি স্বল্প মেয়াদী হলেও প্রকট অপুষ্টির মারাত্মক ক্ষতি হতে শিশু ও মা উভয়কে রক্ষা করে।

খ. দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম–
   ১. পারিবারিক খাদ্যের নিশ্চয়তা – খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানো।
   ২. খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন।
   ৩. পানি বিশুদ্ধকরণ ও খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ।
   ৪. বাড়িতে শাকসবজি লাগানো, মাছ, হাঁস, মুরগির খামার তৈরিতে সাহায্য করা ইত্যাদি।
   ৫. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা।

এভাবে দেশের বিরাজমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি শিক্ষার ব্যাপক ও তৃণমূল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে সমস্যার অনেকটা সমাধান করা সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে কাদেরকে শিক্ষা দিতে হবেঃ যারা সহজেই অপুষ্টির শিকার হয় তাদেরকে বা তাদের অভিভাবকদের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে–

এদের মধ্যে-

- কিশোরী মা
- গর্ভবতী মা ও বয়োজ্যেষ্ঠরা যারা শিশুদের পরিচর্যা করেন।
- পুনর্বাসন কেন্দ্র, উদ্বাস্তু ও বস্তির বাসিন্দা।
- স্কুলগামী শিশু।
- এছাড়াও গ্রামে ও শহরের অশিক্ষিত মায়েরাও অন্তর্ভুক্ত।
- স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী, স্কুলের শিক্ষক, সাংবাদিক এবং জেলা প্রশিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পরিবারের পুরুষ প্রধানও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

কীভাবে শিক্ষা দিতে হবেঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য করা হয়। Mass media-র ব্যবহারে অধিক জনগণকে অল্প সময়ে নির্দিষ্ট তথ্য ও জ্ঞান দেয়া হয়। মাধ্যম বা media-র ব্যবহার উপযোগী, যেখানে শিক্ষার হার কম। মাধ্যম নির্বাচনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো ভাবা প্রয়োজন। নিচে কয়েকটি media ও Channel-এর ব্যবহার দেওয়া হলো–

রেডিও-শ্লোগান, গান, কবিতা	নিরক্ষর জনগণ উপকৃত হয়। খরচ কম, ব্যবহারে সুবিধা।	জনগণের জন্য বার্তা বোধগম্য হবে।
টেলিভিশন (বিজ্ঞাপন, টক শো, নাটক, যাত্রা গান)	ব্যয়বহুল, উপযোগী।	বিদ্যুতের সুবিধা না থাকলে অকার্যকর।
খবরের কাগজ	বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য সুবিধা, সাধারণ বার্তা জনগণের কাছে সহজেই পৌঁছানো যায়।	লেখাপড়া জানা লাগে। শহুরে জনগণের জন্য উপযোগী।
প্রদর্শন (Demonstration)	অল্প খরচে উপযোগী। প্রকৃত খাদ্যসামগ্রী ও শিশুদের ব্যবহার করে প্রদর্শন করা যায়।	স্থানীয় খাদ্য ও পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

কোন পরিবেশে কোন মাধ্যম উপযোগী তা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পেশা ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে। গ্রামীণ পরিবেশে প্রদর্শন, বাড়িতে যাওয়া, জারি গান, নাটক প্রভৃতি বেশি কার্যকর। শহরের ব্যস্ত পরিবেশে খবরের কাগজ, টেলিভিশন, দেওয়াল পত্রিকা, পোস্টার, Leaflet বেশী উপযোগী।

সহায়ক ব্যক্তি

যে কেউ পুষ্টি কথা বলতে পারে। স্কুলের শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মসজিদের ইমাম, চেয়ারম্যান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, NGO কর্মী ইত্যাদি যাদের জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা আছে, যারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে তারাই ভালো Resource Person হবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় বাড়ায় এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। শিক্ষা মানুষের জীবনে মূল্যবোধ বাড়িয়ে, রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের পুষ্টি অথবা শিশু মৃত্যুর হার কমাতে সরাসরি এবং বিশেষভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে। শিক্ষিত মায়ের শিশু স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘায়ু হয়। কারণ মা যত বেশি শিক্ষিত হবে সে তার শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি তত বেশি সতর্ক থাকবে এবং শিশুকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াবে। সর্বোপরি মানুষের বেঁচে থাকা দীর্ঘায়ু হওয়া পুষ্টির ওপর নির্ভরশীর। উচ্চ শিক্ষিত মা শিশুর যত্নের গুরুত্ব, শিশুর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। সমাজের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দুর্বল হলেও শিক্ষিত ও দক্ষ মায়েরা সামাজিক ব্যবস্থার বাইরে নিজের শিশুর তথা পরিবারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারে। শিশুর সুস্বাস্থ্য ও শিশুযত্ন শিশু মৃত্যু কমিয়ে দেয়। বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন ১৯৮৪ অনুযায়ী দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশের মানুষের আয়ুস্কাল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষার অগ্রসরতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষা পরিবারে জনমিতিক কাঠামোকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া নিজ পেশা সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ এবং উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও সাক্ষর ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা বাড়াতে সক্ষম। দক্ষতা বৃদ্ধিরসাথে আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে। আয় বৃদ্ধির সাথে কাজের আনন্দ বিদ্যমান। এই কাজের আনন্দই কর্মীর কর্মনৈপুণ্য আরো বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া সাক্ষরতা মানুষের আকাঙ্খা বৃদ্ধি করে এবং নতুন আকাঙ্খার জন্ম দেয়।

সাক্ষর ব্যক্তি স্বাস্থ্যহানির কুফল সম্পর্কে অধিকতর সচেতন বলে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি মেনে চলার চেষ্টা করে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরিকল্পিত পরিবারের সুফল সম্পর্কে সচেতন ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়ম কানুন সতর্কতার সাথে মেনে চলে বলেই তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখে।

শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে মানুষ পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খায় ফলে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জীবন যাপনের প্রেরণা যোগায়। অন্য পরিবেশকে তারা জানতে পারে। নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করতে পারে এবং নিজের জীবন যাত্রার মান মূল্যায়ন করে মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হয়। ফলে তারা তাদের পরিবারের আকৃতি ছোট রেখে পোষ্যদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদির সংস্থান করতে সচেষ্ট হয়। সুস্থ দেহ এবং সুস্থ্য মন সর্বোপরি শিক্ষাই মানুষকে সার্বিক গুণাবলি বিকাশে ও নানারকম কৌশল আয়ত্ব করতে সাহায্য করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কাজ অনুযায়ী খাদ্যকে প্রধানতঃ কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
   ক. ২ ভাগে
   খ. ৩ ভাগে
   গ. ৪ ভাগে
   ঘ. ৫ ভাগে

২. কোন ধরনের ভিটামিনের অভাবে রিকেট রোগ হয়?
   ক. ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স
   খ. ভিটামিন 'সি'
   গ. ভিটামিন 'ডি'
   ঘ. ভিটামিন 'এ'

৩. কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার কোনগুলো?
   ক. ডিম, দুধ, ডাল
   খ. ক্যালসিয়াম, লৌহ, তামা
   গ. ফলের রস, পানীয়, খাবার পানি
   ঘ. শ্বেতসার, সেলুলোজ, শর্করা

৪. জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
   ক. ১ ভাগে
   খ. ২ ভাগে
   গ. ৩ ভাগে
   ঘ. ৪ ভাগে

৫. নিরক্ষর জনগণ যাতে উপকৃত হয় সেজন্য কোন ধরনের media ব্যবহার করা যায়–
   ক. টেলিভিশন
   খ. খবরের কাগজ
   গ. রেডিও
   ঘ. প্রদর্শন

উত্তরমালা: ১। খ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। খ, ৫। গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুষ্টি বলতে কী বুঝায়?
২. রাসায়নিক প্রকৃতি অনুযায়ী খাদ্যের ছয়টি উপাদানের নাম লিখুন।
৩. খাদ্যের প্রধান ৩টি কাজ উল্লেখ করুন।
৪. ভিটামিন এ, ডি, বি কমপ্লেক্স ও সি এর অভাবজনিত রোগগুলোর নাম লিখুন।
৫. উপানুষ্ঠানিকভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে কারা Resource Person হতে পারবেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
২. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
৩. শিক্ষিত মায়ের শিশু স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু হয়, যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।
৪. উপানুষ্ঠানিকভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে Media ও Channel এর ব্যবহার উল্লেখ করুন।
৫. মানব সম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫.৪: পরিবেশ শিক্ষা
Environment Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবেশ শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের মান উন্নয়ন তথা পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয় দিকগুলো আয়ত্ত করতে পারবেন।

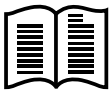

মানুষ তার অবচেতন মনেই অনেক সময় পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে অভ্যস্ত করে তোলে। মানুষের প্রতিটি কর্মকান্ডকে আমরা পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখতে পাই। মানুষ যে স্থানে বাস করে সে স্থানও তার চারপাশের অবস্থানকে পরিবেশ বলে। ঘরবাড়ি, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, মাটি, বায়ু, পানি, সমাজ ইত্যাদি মিলেই তৈরি হয় পরিবেশ। আলো, বাতাস, পানি, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর কৃত্রিম অবকাঠামো এবং গোটা উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সমন্বয়ে যা সৃষ্ট তাই হচ্ছে পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কৃত্রিম পরিবেশ দুটো দ্বারাই মানুষ প্রভাবিত হয়। তাই শিক্ষার সাথে পরিবেশের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশ শিক্ষা হচ্ছে কোন দেশ বা অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে অধিবাসীদের সচেতন করা, মূল্যবোধ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও পরিবেশ রক্ষায় উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে যে শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে তাই হল পরিবেশ শিক্ষা। পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষের মাঝে নিজ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ করে তোলা হয়।

পরিবেশ ও সমাজের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানব জীবনকে বিকশিত করে। আবার মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক কারণে অথবা মানব সৃষ্ট কার্যকলাপে উদ্ভূত দূষিত পদার্থ যখন পরিবেশকে বিষময় করে তোলে তখনই আমরা দূষণ শব্দটা ব্যবহার করি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক এককথায় সকল বিষয়াবলির মধ্যে বর্তমান সভ্য জগতে পপুলেশন ও পলিউশন উভয়েই পরিবেশ তথা বস্তুতন্ত্রের বিষয়বস্তু। ঘনবসতির কারণে শহরের ছোট গলি ও রাজপথের ডাস্টবিন উপচে নানাবিধ বর্জ্য ও আবর্জনা রাস্তা দখল করে চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ত্রুটিপূর্ণ মটরযানের অবিরাম বিকট ও অস্বস্তিকর শব্দ পথচারীদের রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, হজম শক্তি হ্রাস, মাংসপেশির খিচুনী, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট এবং নাক, কান ও গলার সংক্রমণ ইত্যাদি ব্যাধির জন্ম দেয়।

পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য

১. মানব জীবনে পরিবেশের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করা।
২. পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করা।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববান করে গড়ে তোলা।
৪. পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা করা।
৫. বাস্তুসংস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার প্রতিরোধ করা।
৬. শিশু, কিশোর এবং মহিলাদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
৭. নতুন নতুন কর্মসূচি উদ্ভাবন করা।
৮. সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে স্বেচ্ছাকর্মী হতে শিশু, কিশোর, ছাত্র, মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করা।
৯. ব্যাপক ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা নেয়া এবং শহর উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পরিবেশ উন্নয়নে এবং সংরক্ষণের জন্য প্রভাব বিস্তার এবং চাপ প্রয়োগ করা।
১০. পরিবেশ দূষণ, দূষণের বিভিন্ন প্রকার ও পরিণতি সম্পর্ক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।
১১. পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে উদ্বুদ্ধ করা।
১২. স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত স্থান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

প্রকৃতি সংরক্ষণ শিক্ষা মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে। প্রত্যেক দেশেই সরকারি প্রশাসন যেমন বনবিভাগ এবং পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ গোষ্ঠী প্রায়শ:ই পরিবেশ সংরক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সকল কার্যক্রম থেকে উদ্ভুত ধারণা এখনো পরিবেশ শিক্ষাকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রণ করছে। বিদ্যালয়ের ভিতরে পরিবেশ শিক্ষার চর্চা শ্রেণীকক্ষের বাইরের পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে অপ্রকাশিত জ্ঞানকে মানুষের সামনে অনাবৃত করছে। পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধারণা এখনো পরিবেশ শিক্ষার অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করছে। পরিবেশ শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষার কোন না কোন পর্যায়ে অতিরিক্ত অথবা নৈর্ব্যক্তিক বিষয় হিসাবে শিক্ষাক্রমে স্থান পেয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাক্রমকে সমৃদ্ধ করছে। পরিবেশ শিক্ষা বিষয়টি জানতে হলে উন্মুক্ত পরিবেশে যেমন, সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং উন্মুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষা বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করা, মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান বিষয়ের সাথে পরিবেশ শিক্ষা বিষয় যোগ করা যেতে পারে। তাছাড়া স্নাতক এবং স্নাতক প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের নিজের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে পরিবেশ শিক্ষা, পরিবেশ বিজ্ঞান এবং নীতিমালা বাস্তুসংস্থান বা মানবসৃষ্ট বাস্তব বিদ্যার মাধ্যমে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পরিবেশের প্রকারভেদ

পরিবেশকে ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- স্থানীয় পরিবেশ, আঞ্চলিক পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ।

স্থানীয় পরিবেশ

কোন একটি দেশ বা কোন নির্দিষ্ট এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশকে স্থানীয় পরিবেশ বলে। মাটির প্রকৃতি, শিল্পায়ন, তাপমাত্রা, বনজ সম্পদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট এলাকার স্থানীয় পরিবেশ গড়ে উঠে।

আঞ্চলিক পরিবেশ

কয়েকটি দেশ মিলে একটি অঞ্চল গড়ে উঠে। ঐ অঞ্চলের সামগ্রীক পরিবেশকে আঞ্চলিক পরিবেশ বলা হয়। অঞ্চলভেদে পরিবেশের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন- এশীয় অঞ্চলের পরিবেশের সাথে ইউরোপীয় অঞ্চলের পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের অনেক পার্থক্য দেখা যায়, আবার প্রতিটি অঞ্চলের কিছু কিছু সাধারণ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ঐ অঞ্চলের সব জায়গায় মোটামুটি একই রকম।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ

শিল্পোন্নত দেশগুলো দ্বারা মূলতঃ আন্তর্জাতিক পরিবেশ প্রভাবিত। পরিবেশ দূষণের কারণে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ সমুদ্র গ্রাস করে নিতে পারে। সারা বিশ্বের ২৪টি শিল্পোন্নত দেশ সি.এফ.সির ব্যবহার ৩৫% কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। বনাঞ্চল রক্ষায় ২৫% বনভূমি নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের হাত থেকে সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ সংস্থা বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সামগ্রিক পরিবেশের কোন উপাদান যেমন কোন ভৌত রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিঃসরণের ফলে সমগ্র পরিবেশ যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকারক প্রভাবের সম্মুখীন হয় তখন ঐ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

পরিবেশ দূষণ মূলতঃ তিন প্রকার

পরিবেশকে ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন স্থানীয় পরিবেশ আঞ্চলিক পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ।

যেমন- শক্তি বিষয়ক দূষণ, রাসায়নিক দূষণ, জীব পরিবেশগত দূষণ। শব্দ, তাপ, আলোক বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের ফলে শক্তি বিষয়ক দূষণ ঘটে থাকে। জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থের আধিক্যের ফলে রাসায়নিক দূষণ ঘটে থাকে। আর বিভিন্ন জীবনের সংখ্যাধিক্যের ফলে জীব পরিবেশগত দূষণ ঘটে থাকে। যেমন- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আধিক্যের ফলে নানারকম রোগবালাই মহামারী আকারে দেখা দিয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষাক্রমে স্থান করে নিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহিত কার্যক্রম

১. পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা।
২. পরিবেশ সম্পর্কিত সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করা।
৩. পরিবেশ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ নেটওয়ার্ক তৈরি করা।
৪. পরিবেশ সংক্রান্ত সেমিনার, কর্মশালা এবং র‍্যালীর ব্যবস্থা করা।
৫. নিরক্ষর জনগণের জন্য বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম গড়ে তোলা।

৬. দলীয় আলোচনা, স্থানীয় মেলার ব্যবস্থা করা।
৭. শহরের ড্রেন, নালা, নর্দমা, গারবেজ, ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সচল করা এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ এবং সিটি কর্পোরেশনকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সচেতন করা।
৮. পরিবেশ দূষণ করতে পারে এমন শিল্পবর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থাকরণ।
৯. যানবাহন থেকে কালো ধোয়া নির্গমন ও শব্দযুক্ত হর্ণ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।
১০. পরিবেশ দূষণরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সকলকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১১. পরিবেশ সংক্রান্ত সামাজিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
১২. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈবসার ও জৈবকীট ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা।
১৩. ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিষিদ্ধকরণ।
১৪. বনায়ন কর্মসূচি জোরদারকরণ, বেশি করে গাছ লাগানো কার্যক্রম গ্রহণ করা।
১৫. শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণ।
১৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৭. দেশ ও জাতিকে দুর্যোগ ও পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম হাতিয়ার হিসেবে দেশের সর্বত্র প্রচুর গাছপালা লাগানো ও বনভূমির নির্বিচার নিধনরোধে আইন প্রণয়ন ও এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
১৮. গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকার জন্য প্রতিবেদন প্রদানের ব্যবস্থা করে এদের কার্যকলাপের মূল্যায়ণ সাপেক্ষে উৎসাহজনক পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা।
১৯. শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে পরিবেশ দূষণকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারিভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

অবনতিশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সব ধরনের দূষণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মানুষ সুস্থ পরিবেশে জীবন যাপন করতে পারবে এবং আগামী প্রজন্মের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হবে। পরিবেশ উন্নয়নে নুতন নুতন উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা ভাবনা চলছে। অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন। এই সম্মেলনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করে তোলা। মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করা যে, সবাইকে এই উদ্যোগে শরীক হতে হবে। কারণ আমাদের বেঁচে থাকার পৃথিবী একটাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানুষ কোন ধরনের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়?
   ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ
   খ. সামাজিক পরিবেশ
   গ. কৃত্রিম পরিবেশ
   ঘ. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পরিবেশ

২. পরিবেশকে বিষময় করার কারণ কোনটি?
   ক. রাজনৈতিক
   খ. প্রাকৃতিক
   গ. সামাজিক
   ঘ. অর্থনৈতিক

৩. প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ শিক্ষা কোন বিষয়ের শিক্ষাক্রমকে সমৃদ্ধ করেছে?
   ক. বিজ্ঞান শিক্ষা
   খ. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা
   গ. ইসলাম শিক্ষা
   ঘ. ভূগোল শিক্ষা

৪. পরিবেশকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. এক ভাগে
   খ. দুই ভাগে
   গ. তিন ভাগে
   ঘ. চার ভাগে

উত্তরমালা: ১। ঘ, ২। খ, ৩। ক, ৪। গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?
২. পরিবেশ শিক্ষার সংজ্ঞা দিন।
৩. ত্রুটিপূর্ণ মোটরযানের শব্দ কি কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে।
৪. সুস্থ্য দেহ, সুন্দর পরিবেশ–এ সম্পর্কে মতামত দিন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশ দূষণের সাথে সম্পর্কি-ব্যাখ্যা করুন।
২. পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।
৩. সুষ্ঠুভাবে শিল্পবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে পরিবেশ দুষণ কমানো সম্ভব-এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ মতামত দিন।
৪. পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহিত কার্যক্রমগুলি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫.৫: তরুণ এবং সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম
Education Programs for the Youth and Less Priviledged (Disadvantaged) Groups

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখা করতে পারবেন;
- তরুণ সমাজের উন্নয়নের জন্য কি ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- সমাজে সুবিধাবঞ্চিতদের কিভাবে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হয় যখন এটি মানব সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। একটি দেশের মোট জাতীয় আয় সে দেশের উন্নয়নের আংশিক চিত্র তুলে ধরে মাত্র। উন্নয়ন নির্ধারণের অন্যতম সূচক হচ্ছে মানব সম্পদ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যা, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, জীবিকার নিশ্চয়তা, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল এবং উৎপাদনক্ষম হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অর্থের। আর এ অর্থের যোগান সহজতর হয় যদি শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মক্ষম ও উপার্জনক্ষম হয়ে গড়ে ওঠে এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়। শিক্ষাকে তাই বাহিরের কর্মজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে শিক্ষার সঙ্গে কর্মজীবনের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। চাকুরীর সুযোগ সুবিধা কম বিধায় বহু তরুণ ও যুবক উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এ শিক্ষা তাদেরকে কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। এভাবেই শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি হচ্ছে যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন অবদান রাখতে পারছে না। শিক্ষাকে তাই উন্নয়নের অন্যান্য ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা দরকার।

কৃষি, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, পরিবার পরিকল্পনা, প্যারামেডিকস, নার্সিং, ক্ষুদ্র ও লাগসই প্রযুক্তি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন এক ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন যা গড় মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহর এলাকার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকার স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অব্যবহৃত জনশক্তি এবং সম্পদ জাতীয় উন্নয়নে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। গ্রামীণ এলাকার উন্নতির জন্য স্থানীয় প্রয়োজন ও জাতীয় উন্নয়ন চাহিদাকে মুখামুখী বিবেচনা করা দরকার। দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য প্রয়োজন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে একযোগে সহযোগীরূপে কাজে লাগানো এবং এই উভয় প্রকার শিক্ষাতেই জীবনমুখীতা, কর্মমুখীতা ও প্রয়োগমুখীতার উপর গুরুত্ব আরোপ।

সবার জন্য উৎপাদনশীল ও পূর্ণাঙ্গ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে আয়ের অথবা আয় বৃদ্ধির বিষয়টি অনেকটা নিশ্চিত করা যায়। আমাদের মনে রাখা দরকার কর্মহীন কিংবা সঠিক কর্মে নিয়োজিত নয় এরকম লোকের অধিকাংশই সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীভুক্ত মানুষ। মানব সম্পদ উন্নয়ন বা মানব পুঁজি গঠন ধারণায় মানুষকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবেই দেখা হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কিছু কৌশলের ভিত্তিতে জাতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। এই কৌশলগুলোর মধ্যে অন্তত চারটি উপাদান থাকা দরকার যেমন– (১) মানব উন্নয়নের একটি তথ্য চিত্র তৈরি (২) মানব উন্নয়নের

লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ (৩) বাজেটের কাঠামোগত পরিবর্তনের পরিকল্পনা তৈরি (৪) বাস্তবসম্মত একটা রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ।

দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, অনমনীয়তা ও অব্যবস্থার কারণে নিরক্ষর নারী পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। এদের মধ্যে আছে তরুণ সমাজ ও সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠি। তরুণ সমাজের মধ্যে যারা স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, তাদের কর্মক্ষম করার ক্ষেত্রে গার্মেন্টস কার্যক্রমে ট্রেনিং, কম্পিউটার, সেলাই, বাঁশ বেতের কাজ, ওয়েলডিং, মাছ চাষ, মৌমাছি চাষ, মৃৎশিল্প, ব্লক ও বাটিক, হেয়ার কাটিং এগুলো যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন- শিক্ষায়, অর্থনীতিতে ও সংস্কৃতিতে এবং সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যারা পিছিয়ে আছে যারা সংখ্যায় অল্প যেমন উপজাতি, বেদে সম্প্রদায়, সাওতাল, জেলে। সমতলে বসবাসকারী উপজাতি হচ্ছে সাওতাল, রাখাইন, মগ এবং পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতি হচ্ছে মণিপুরি, ত্রিপুরা, খাসিয়া, কুকি, চাকমা, মারমা, গারো, হাজং ইত্যাদি। এ সকল সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও নিজস্ব জীবনধারা রয়েছে। ফলে তারা মূল জনগোষ্ঠী থেকে স্বকীয়তা বজায় রাখতে আগ্রহী। শিক্ষা সম্পর্কেও এরা সচেতন নয় এবং উপজাতিদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। ফলে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে ওরা আগ্রহী নয়। ওদের মধ্যে কিছু আছে কৃষি কাজ ও শিকার করে জীবিকা নির্বাহ কর। আবার কিছু আছে শিকার, কৃষি কাজ ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা সাপ নিয়ে খেলা দেখা এবং বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছরার ঔষধ বিক্রি করে থাকে। সাপের চামড়া বিক্রি করে, সাপের বিষ বিক্রি কর ে র।

শিক্ষার প্রথম পাঠ হল সাক্ষরতা। খুব সাধারণ অর্থে সাক্ষরতা মানে অক্ষর চিনে পড়তে পারা, লিখতে পারা ও হিসেব-নির্দেশ করতে পারা। যাকে ইংরেজিতে বলে 3RS (Reading+ Writing + Arithmetic) বিষয়টিকে আমরা লিখতে পারা। শিক্ষার অভীষ্ট শুধু সাক্ষরতা লাভ নয়, সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, সহিষ্ণু সততাপরায়ণ ও ন্যায়সঙ্গত মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ নিতে পারছে না বা ভর্তি হয়েও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে এমন সব বঞ্চিত শিশু-কিশোরের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। বয়স্ক শিক্ষার আওতায় তিনটি ধারা থাকবে–সাক্ষরতা শিক্ষা, সচেতনতা শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষা। বয়স্ক সাক্ষরতার কোর্স এলাকাভিত্তিক ও চাহিদা অনুসারে প্রণীত হবে। যে সমস্ত এলাকায় যে ধরনের চাহিদা সেখানে সেটাই শিখানোর ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে ব্রাক ও অন্যান্য NGO রয়েছে যারা সুবিধাবঞ্চিতদের নিয়ে কাজ করছে। সাক্ষরতার অর্জিত দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ রাখা বাঞ্চনীয়। গ্রামে পাঠ অনুশীলন-চক্র ও গ্রাম শিক্ষা-মিলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং গণশিক্ষার জন্য লোককেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা দরকার। বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করা যেতে পারে। গণশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকার সমন্বয় করা দরকার। সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর এবং মানব সম্পদকে শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা দরকার।

সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষা কার্যক্রম

জাপানের নাগরিক তোশিকো অনিশির বিদেশী সহায়তায় কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে গড়ে উঠেছে মজুমদার ওয়ান ড্রপ প্রাইমারী স্কুল। এই স্কুলটি বাংলাদেশের তৃণমূলের দরিদ্র শিশুদের জন্য গড়ে উঠেছে যাদের পরিবারে বাবা মা অন্যের খেতে কাজ করেন। অনেকে দিনমজুর আবার অনেকের বাবা অথবা মা আলাদা হয়ে গেছেন। বিস্ময়ের

বিষয় হলো এই শিশুরাই হবে তাদের পরিবারের প্রথম শিক্ষিত মানুষ। এক বছর আগে যাত্রা শুরু করে স্কুলটি। এ বছর শুধু প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পড়েছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে আবার নতুন করে প্রথম শ্রেণীতে ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি মিলে তখন শিক্ষার্থী হবে ৪০ জন। স্কুল তৈরিতে ওয়ান ড্রপ ৬০ শতাংশ অনুদান দেয়। আর বর্তমানে দুজন শিক্ষক ও কর্মীদের বেতন, স্কুলের বিভিন্ন আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, বাচ্চাদের এক বেলা খাবার দিচ্ছে ওয়ান ড্রপ। বাংলাদেশ আর জাপানের শিক্ষা পদ্ধতি মিলে এই শিশুদের বড় করা হবে। (সূত্র-প্রথম আলো ৩১/১২/১৬)

ওয়ান ড্রপ স্কুলের শিশুরা খেলছে জাপানি খেলা (সূত্র-প্রথম আলো ৩১/১২/১৬)

সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য আর একটি প্রতিষ্ঠান স্পেনের সহায়তায় educo (Education and Development Foundation) এটি একটি NGO প্রতিষ্ঠান। এদের বেশ কয়েকটি শাখা রয়েছে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ) গাজীপুর (কালীগঞ্জ) এবং ময়মনসিংহ (ভালুকা এবং ত্রিশাল)। এদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠসামগ্রী পোষাক এবং একবেলা খাবার সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য সেবাও দেয়া হয়। এদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করার পরও শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। যাতে করে একজন শিক্ষার্থী তার ইচ্ছেমত লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

ঢাকার খিলগাঁও আবাসিক এলাকায় পল্লীমা সংসদ পরিচালিত বঞ্চিতদের জন্য রয়েছে বিদ্যালয়। এ বছর ১ জানুয়ারী থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে পল্লীমা বিদ্যাপীঠের। বেলা দুইটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্যক্রম চলে এই বিদ্যালয়ে। সামর্থ্য থাকলে একটি নির্দিষ্ট ফি দিতে হয় আর না থাকলে বিনামূল্যে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি দেয়া হয় শিক্ষা উপকরণ। তাছাড়া আছে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। (সূত্র-প্রথম আলো ০৭/১/২০১৭)

মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রধানত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জীবনাচরণ; রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান এবং মানব সম্পদ চেতনা, কল্পনা, আবেগ, ধ্যানধারণা ইত্যাদির সৃষ্টিশীল বহিঃপ্রকাশ– সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার মত সংস্কৃতিও চর্চার বিষয়। শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের যে কোন কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সচেতনভাবে সন্নিবেশিত করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু ওরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। ওদের সাথে সকল ক্ষেত্রে সকল সময় সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা দরকার।

- সকল কার্যক্রমে সকলকে সমান সহযোগিতা দেয়া।
- ওদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য সরকারি প্রচার ও মোটিভেশনাল কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- পর্যাপ্ত এবং এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা নিজ নিজ মাতৃভাষায় বই রচনা করা।

যুবক ও সুবিধাবঞ্চিতদের কর্মের সংস্থান করে ওদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা দরকার যাতে ওরা দেশে এবং বিদেশে কাজ করে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উন্নয়ন নির্ধারণের প্রধান সূচক হল–
   ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
   খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন
   গ. সামাজিক উন্নয়ন
   ঘ. রাজনৈতিক উন্নয়ন

২. দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য কোন ধরনের শিক্ষাকে সহযোগীরূপে কাজে লাগানো দরকার?
   ক. আনুষ্ঠানিক
   খ. অনানুষ্ঠানিক
   গ. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক
   ঘ. উপানুষ্ঠানিক

৩. মজুমদার ওয়ান ড্রপ প্রাইমারী স্কুলটি কোন জেলায়?
   ক. ঢাকা
   খ. চট্টগ্রাম
   গ. সিলেট
   ঘ. কুমিল্লা

উত্তরমালা: ১। খ, ২। গ, ৩। ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দেশে নিরক্ষর নারী ও পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাবার কারণ কি?
২. বাংলাদেশের কোন কোন উপজাতি সমতলে বাস করে?
৩. সাক্ষরতা বলতে কি বুঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উপজাতীদের জীবনধারা উল্লেখ করুন।
২. অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ ব্যাখ্যা করুন।
৩. সুবিধাবঞ্চিতদের লেখাপড়ার যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দিন।

পাঠ ৫.৬: বয়স্ক শিক্ষা
Adult Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বয়স্ক শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বয়স্ক শিক্ষার পরিধি ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন;
- বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বয়স্ক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বয়স্ক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন।

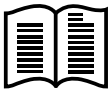

শিক্ষার উপরই দেশ ও জাতির উন্নতি নির্ভরশীল। শিক্ষার সাথে ব্যক্তি তথা জাতীয় উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে থাকে। তাছাড়া শিক্ষা কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করায় ত্বরান্বিত হয় জাতীয় উন্নয়ন।

বয়স্ক শিক্ষা

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে নিয়মিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যারা অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তাদের জন্য শিক্ষামূলক যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, সাধারণভাবে তাকেই বয়স্ক শিক্ষা বলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষাক্রমের বাইরে বয়স্ক মানুষদের জন্য সংগঠিত সেই শিক্ষাব্যবস্থা, যা তাদের জীবনধারা বিকাশে সাহায্য করে। বয়স্কদের আয় বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলি, উন্নত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে জীবনের সমস্যা সমাধানে তাদের অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলা এর মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে তারা ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠে এবং তাদের বিকাশের সব বাধা দূর করে নিজেদেরকে সমাজের কাজকর্মের উপযোগী করে নিতে পারে।

শিক্ষা ব্যক্তিকে তার প্রতিদিনের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করার জন্য এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী, ক্ষমতা ও দক্ষতা ইত্যাদির বিকাশে সাহায্য করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে Bradford (1949) বলেন "বয়স্ক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষামূলক পন্থার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং দলের বৃত্তিমূলক পেশাগত, ব্যক্তিগত এবং পৌরসমস্যা সনাক্তকরণ ও সমাধানের উপযোগী তথ্য, মানসিকতা, সংশোধন ও দক্ষতা অর্জন করার লক্ষ্যে স্বতঃপ্রণোদিত নিবিড় ও সংগঠিত প্রচেষ্টা"।

Malcolm S. Knowles এর কথায় "বয়স্ক শিক্ষা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা বয়স্করা একক বা যৌথভাবে তাদের আত্মোন্নয়নের জন্য এবং সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মী ও সদস্যদের সব রকম বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করে। এটি একটি শিক্ষাগত প্রক্রিয়া, যা প্রায়ই উৎপাদন প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অথবা সেবামূলক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয়"।

তানজানিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি Nyerere বলেন "বয়স্ক শিক্ষা হচ্ছে মুক্ত মানুষ ও মুক্ত সমাজের উন্নয়নের চাবিকাঠি। মানুষকে নিজেদের জন্য চিন্তা করতে, নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাহায্য করা হচ্ছে এর কাজ"।

এ সমস্ত মতামত পর্যালোচনা করে বুঝা যায় যে- যে শিক্ষা একজন বয়স্ক ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা, অনুরাগ, কার্যক্ষমতা ইত্যাদির উন্নতি সাধন করে এবং তার পেশাগত, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে তাই বয়স্ক শিক্ষা। জাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষার ধারণার পরিবর্তন ঘটছে তবে একটি জিনিস মনে রাখা দরকার বয়স্ক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হবে এবং বয়স্ক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

বয়স্ক শিক্ষার প্রসঙ্গে দুটি শব্দের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই দুটি শব্দ হচ্ছে বয়স্ক এবং শিক্ষা। বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিতে 'বয়স্ক' শব্দটির ভিন্ন অর্থ দেখা যায়। পাশ্চাত্যে যারা মৌলিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে এবং আর্থিকভাবে আর পিতামাতার উপর নির্ভরশীল নয় তাদেরকেই বয়স্ক বলা হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য এই ব্যাখ্যাটি আবার অন্যরকম। অনেক দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশই কখনও স্কুলে যায়নি।

অধিকাংশ দেশেই যেখানে বিশেষ ধরনের নিজস্ব শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে বয়স্ক শিক্ষার জন্য জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ সমস্ত দেশে বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইংল্যান্ড ও সুইডেনে বয়স্ক শিক্ষা শ্রমজীবি মানুষের মাঝে শিক্ষার জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। ডেনমার্কে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য অনেক ফোক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। উন্নয়নশীল দেশে বয়স্ক শিক্ষাকে মূলতঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণের পন্থা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে বয়স্ক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন বলে সনাক্ত করা যায়। কিন্তু যুক্তরাজ্যে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির কোন নিজস্ব একক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই। বিরাট দেশের বিভিন্নমুখী চাহিদা, একক সংগঠনের কর্তৃত্ব ও প্রশাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা ও বিভিন্নমুখিতার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্ক শিক্ষা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- জনস্পদ উন্নয়ন, স্টাফ উন্নয়ন, উন্নয়নমূলক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, কর্মকালীন শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষা ইত্যাদি। ব্যাপক অর্থে বয়স্ক শিক্ষা বলতে একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় তা হল বয়স্কদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া। পরিণত বয়সের নারী, পুরুষ নুতন জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুরাগ, মূল্যবোধ ইত্যাদি যে সমস্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে তাই হল বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্গত।

ইউনেস্কোর হিসাবে, ১৫ এবং তদুর্ধ বয়স্কদের বয়স্ক শ্রেণিতে দেখা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত এ শ্রেণির কোন ব্যক্তিকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়াকে বয়স্ক শিক্ষা বলে। বয়স্ক শিক্ষার আওতাধীন বয়স্কদের বয়স্কসীমা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। যেমন গণচীনে ১৫ থেকে ১৯, ইরানে ১০ থেকে ৪৫ এবং আলজিরিয়ায় ১৫ থেকে ৩৫ বাংলাদেশে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এক সময় মেয়েদের জন্য ৮-৪৫ এবং পুরুষদের জন্য ১১-৪৫ বয়ঃসীমা নির্ধারণ করেছিল। ভারতে বয়স্ক শিক্ষা প্রথম পর্যায়ে বয়ঃসীমা ১৫ থেকে ৩৫ বছর।

বাছিরন নেছার মাথার চুল পেকে গেছে। শরীরের চামড়ায় পড়েছে ভাঁজ। চোখে নেই আগের সেই তীক্ষ্নতা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে দেহ। কিন্তু নুয়ে পড়েনি প্রবল ইচ্ছাশক্তি। প্রতিদিন হেঁটে তিনি বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস করেন। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী তিনি কয়েক দিন পর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বসবেন। (সূত্রঃ ১১/১১/১৬ইং দৈনিক প্রথম আলো)

মোছাম্মাত বাছিরন নেছা (৬৫ বছর)

বয়স্ক শিক্ষার পরিধি বা পরিসর

বয়স্ক যারা তারা সবাই বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচারবোধ সম্পন্ন। তারা সবকিছুই যাচাই করে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। যে জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা যাবে, যাতে লাভবান হওয়া যাবে যাতে বর্তমানের প্রয়োজন মিটানো যাবে সে ধরনের জ্ঞানই তাদের দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যা, সমাধান ও সুন্দর জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সে সবই থাকবে তাদের শিক্ষার মধ্যে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সবই এই সর্বাত্মক উন্নয়নের অন্তর্গত। তাই বয়স্কদের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা দরকার। উন্নত বিশ্বে বয়স্ক শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ ও শিখন সামগ্রী উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্ব কখনই উন্নত বিশ্বের মডেল হুবহু অনুসরণ না করে নিজেদের উপযোগী কার্যকর মডেল তৈরি করার কথা চিন্তা করে থাকেন।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের বয়স্ক শিক্ষার বিষয়বস্তু

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নতুন উন্নত সমাজ গড়ার মানসিকতা নিয়েই তাদের এই শিক্ষা কার্যক্রমের প্যাকেজ তৈরি করে থাকে। অনেক দেশেই প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়েও বেশি ১৫+ বছরের উর্ধ্বে বয়স্করা লিখতে বা পড়তে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই নিরক্ষরতা দূরীকরণই বয়স্ক শিক্ষার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতাকে সমার্থক করার ফলে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা এবং সম্ভাবনা হারিয়ে যায়। কোন বিশেষ দেশ বা গোষ্ঠীর উন্নতির মাত্রা এবং পর্যায়ের ভিত্তিতে বয়স্ক শিক্ষার পরিসর বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

জ্ঞান অর্জন

বয়স্ক শিক্ষা সকল নাগরিকের সাক্ষরতা গাণিতিক ধারণা, হিসাব, দক্ষতা, চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও প্রাসঙ্গিক কার্যকরী জ্ঞান অর্জনে সমর্থ করে।

সচেতনতা অর্জন

বয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রম তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে। যেমন তারা যে সমাজে বাস করে এর বর্তমান অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করা, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহ সৃষ্টি, সমস্যা সমাধান, বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতার উৎস, প্রচলিত আইন সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন এই শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত।

দক্ষতা অর্জন

বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাভিত্তিক কোর্সের ব্যবস্থা করা, অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সাধারণ ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো, পেশাগত যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য পেশাগত দক্ষতার ক্রমবিকাশ, শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে পল্লী অঞ্চল থেকে আসা লোকজনকে শহরে বাসের উপযোগী করে তোলা।

Coles Edwin Townsend তাঁর বই Adult Education in Developing Countries-এ বয়স্ক শিক্ষার মূল বিষয়গুলোকে নিম্নলিখিত শিরোনামে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেন:

ক. **সাধারণ শিক্ষা:** প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয়বস্তু হবে সাক্ষরতা ও হিসাব নিকাশ। পরবর্তীতে মূল উপাদানগুলো হবে–

- ভাষা
- হিসাব দক্ষতা
- দৈনন্দিন জীবন উপযোগী দক্ষতা
- পৌর ও সামাজিক জ্ঞান।

খ. **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ:** চাহিদা মত সকল প্রকার বৃত্তিমূলক ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. **পৌর ও সামাজিক শিক্ষা:**

- পৌর শিক্ষা
- পরিবার বিষয়ক শিক্ষা
- ভূমিকা শিক্ষা (Role Education) ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ
- গোষ্ঠী উন্নয়ন
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
- ব্যক্তিগত অনুরাগ/পছন্দ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে স্বাক্ষরতা ও মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিকতা শিক্ষা, বহুমুখী বৃত্তিমূলক, স্বকর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা, ভাষা, হিসাব নিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা প্রভৃতি বয়স্ক শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে সমাজে যারা আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। সাক্ষরতা কার্যক্রমের তিনটি অপরিহার্য উপাদান থাকতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষা যথাসম্ভব কর্মভিত্তিক হবে। যে ধরনের কাজেই একজন বয়স্ক ব্যক্তি নিয়োজিত থাকুক না কেন সেই কাজটি যাতে সে যথেষ্ট পারদর্শিতা ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে সেই উপযোগী অনুরাগ, দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্য ও দক্ষতা তাকে দেওয়াই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে।

এই শিক্ষা ব্যক্তিকে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে সক্রিয় ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং প্রধান প্রধান জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করবে।

বয়স্ক শিক্ষা এমন এক শিক্ষা যা ব্যক্তিকে সাক্ষরতা দেবে, যার জন্য পৃথিবীর জ্ঞান তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পরিবেশের সাথে সংগতি বিধান আর অর্থনৈতিক উন্নততর অবস্থার জন্য উন্নত কারিগরি ও উৎপাদন প্রক্রিয়া শেখাবে।

বিশ্বের উন্নত অংশে বয়স্ক শিক্ষা অন্য রকম। সেখানে এই শিক্ষাকে সমাজের বঞ্চিত অংশের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ বলে বিবেচনা করা হয় না। সেখানে মৌলিক শিক্ষার সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে বঞ্চিত খুব অল্প পরিমাণ লোকই আছে। তাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও বয়স্ক অব্যাহত শিক্ষার উন্নততর বহুমুখী কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে সমাজে যারা আর্থিক সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

একটা জাতির শিক্ষা ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিপুল সংখ্যক নিরক্ষরকে নিয়ে কোন দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। নিয়মিত সাধারণ শিক্ষা ধারার সঙ্গে বয়স্ক সাক্ষরতা বিস্তারের মাধ্যমেই জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন করার প্রচেষ্ঠা নেয়া প্রয়োজন। একমাত্র বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তা, বিচার শক্তি ও সামাজিক চেতনায় উন্মেষ ঘটিয়ে নিরক্ষর মানুষকে উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। বয়স্ক সাক্ষরতার গুরুত্ব নিম্নরূপ:

মৌলিক অধিকার

শিক্ষা যে মৌলিক অধিকার, সাক্ষরতা সেই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

পরিবর্তনের আশংকা

মানুষের অজ্ঞতা, রীতিনীতি ও সামাজিক অবস্থা এবং ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন যখন সম্ভব, তখন অন্যের পরিবর্তনের কথা জেনে মানুষ নিজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়।

চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ

সাক্ষরতা মানুষকে আবেগ ও সংস্কারমুক্ত হয়ে স্বচ্ছ চিন্তা করতে শেখায়। স্বাক্ষর ব্যক্তি ব্যক্তিগত ও আর্থ সামাজিক অবস্থার কার্যকরণ বিশ্লেষণ করতে পারে। সঠিক ও উপযুক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।

মানবিক গুণাবলির বিকাশ

সাক্ষরতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সৃজনীশক্তি, সহনশীলতা, সামর্থ ইত্যাদি মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে।

জ্ঞানার্জন

স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মত বইপত্র, পুস্তিকা ও সংবাদপত্র পড়ে বহুবিধ জ্ঞানার্জন করতে পারে। অপরপক্ষে নিরক্ষর ব্যক্তি অন্যের কথা, আলাপ আলোচনা রেডিও, টেলিভিশনের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

মূল্যবোধের উন্নয়ন

সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিশৃংখলা, উশৃংখলতা, দূর্নীতি ইত্যাদি সাক্ষরতার মাধ্যমে রোধ করে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ

বয়স্ক সাক্ষরতার ফলে তারা বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে ও সেগুলো নিয়ে ভাবতে শিখে। স্বেচ্ছায় সমাজ উন্নয়নমূলক ও হিতকর কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে ঐক্যবোধেরও সৃষ্টি হয়।

নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ

সাক্ষরতার মাধ্যমে জনগণ নাগরিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিজেদের অধিকার আদায় ও অধিকার প্রয়োগে সচেষ্ট হয়।

কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি

নিজ পেশা সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ এবং উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম ও পেশার দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হয়।

স্বাস্থ্যবিধি

বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিবিধান, স্বাস্থ্যহানির কুফল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া খাদ্য নির্বাচন, খাদ্য গ্রহণের নিয়ম কানুন, খাদ্য-সংরক্ষণ, রন্ধন প্রণালী, শরীরচর্চা ও রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা

বয়স্ক শিক্ষা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বড় পরিবারের অসুবিধা, ছোট পরিবারের সুবিধা এবং পরিবার ছোট রাখার পরিকল্পনা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে তারা উন্নত পরিবেশকে জানতে পারে। নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করে নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উদ্যোগী হতে পারে।

বয়স্ক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা

প্রতিটি দেশ ও জাতি তার নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করতে চায়। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তারা আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারে না। তাই এর সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে, দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ করা দরকার। যেমন–

- সচেতনতার অভাব
- স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক অঙ্গিকার
- সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব
- জাতীয় পর্যায়ে নিজস্ব ধরনের অবকাঠামো তৈরিতে আগ্রহের অভাব
- ঝরে পড়া
- নিম্নমানের কৃতিত্ব/রেজাল্ট
- নিরক্ষরতা প্রত্যাবর্তন/দক্ষতার স্থায়ীত্বের অভাব

প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

সচেতনতা সৃষ্টির কাজ এমন ব্যাপকভাবে করতে হবে যাতে তা সমগ্র জনমানুষকে আলোড়িত করে একটি জাতীয় সচেতনতা ও ঐক্যমত গড়ে তোলে এবং তা জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। সাক্ষরতার ব্যাপারে স্থায়ী উদ্যোগ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। সুনির্দিষ্ট নীতি প্রবর্তনপূর্বক সাক্ষরতা কর্মসূচি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও বাস্তবমুখী হওয়া দরকার।

সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সাক্ষরদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশগ্রহণ, নিরক্ষরদের প্রেরণাদান, পরিবেশ গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সাক্ষরতা হার বাড়ার জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

কোন একটি গবেষণা সংস্থা গঠনের মাধ্যমে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয় করা যাবে। ঝরে পড়া রোধ করার জন্য শিক্ষা উপকরণ, বই পুস্তক আকর্ষণীয় করে তোলা। তাছাড়া শিক্ষাদান পদ্ধতি ও আধুকিরণ করা দরকার। কৃতিত্বের নিম্নমানের জন্য বয়স্কদের অনুরাগ প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত শিখন সামগ্রী এবং পছন্দ মাফিক পদ্ধতিতে পরিবেশন করা দরকার।
মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রগুলোতে ভর্তি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সমস্যার সমাধান, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সক্রিয় করা ইত্যাদির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। মনিটরিং ও ফিডব্যাক সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সীমাবদ্ধতা কার্যক্রমের সঠিক বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

উপসংহার

দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য বয়স্ক শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বড় এবং মূল উপাদানই হল শিক্ষা। সকলের শিক্ষা ব্যতিত কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতি দ্রুত গতিতে বিকাশের ফলে সমাজ অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। নিয়মিত সাধারণ শিক্ষাধারার সঙ্গে বয়স্ক সাক্ষরতা বিস্তারের মাধ্যমেই জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও তাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বয়স্ক শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
   ক. শুধু নিরক্ষর ব্যক্তির জন্য শিক্ষা
   খ. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত ব্যক্তির জন্য শিক্ষা
   গ. সকল বয়স্ক ব্যক্তির জন্য শিক্ষা
   ঘ. সকল মানুষর জন্য শিক্ষা

২. বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে–
   ক. ব্যবহারিক ও কার্যকরী সাক্ষরতা দান
   খ. শুধু হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান দান
   গ. শুধু লিখতে ও পড়তে পারার মত সাক্ষরতা দান
   ঘ. নিরক্ষরতা দূরীকরণ

৩. নিরক্ষর ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে–
   ক. অব্যাহত শিক্ষার সাহায্যে
   খ. পত্র-পত্রিকা থেকে
   গ. অন্যের কথা শুনে
   ঘ. বই-পুস্তক পড়ে

উত্তরমালা: ১। খ, ২। গ, ৩। গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বয়স্ক শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
২. Malcolm Knowles এর মতে বয়স্ক শিক্ষা কী?
৩. বয়স্ক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়নশীল দেশের বয়স্ক শিক্ষার বিষয়বস্তুর বর্ণনা দিন।
২. বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
৩. বয়স্ক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করুন।